তারাবাই

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

মূল্য বার আনা

উ প হা র

তারাবাই

—ঃ*ঃ—

প্রথম অধ্যায়

রাজপুতনার অন্তর্গত টৌডা একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। আমরা যে-সময়ের কথা বলিতেছি, সে-সময়ে সেখানে শূরতান সিংহ নামক একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। প্রাচীন তক্ষশীলা সে-সময়ে তোডাতঙ্ক নামে অভিহিত হইত। তোডাতঙ্কই সাধারণ কথায় টৌডা বা তোডা নামে পরিচিত ছিল। শূরতান এই টৌডা রাজ্যের নরপতি ছিলেন।

শূরতান—শোলাঙ্কি রাজপুতবংশ-সম্ভূত। যে চৌলুক্য নৃপতিগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া আনহলবারাপত্তনে আধিপত্য করিয়াছিলেন, রাও শূরতান তাঁহাদের বংশধর।

খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে পাঠানসম্রাট্ আলাউদ্দীনের বীরত্বপ্রভাবে শূরতানের পূর্ব্বপুরুষগণ পত্তন হইতে বিতাড়িত হইয়া ভারতের মধ্যপ্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেখানে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া রাজ্যচ্যুত চৌলুক্যগণ এই তোডাতঙ্ক অধিকার করেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তাঁহাদের বংশধরগণ দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এখানে রাজত্ব করিতে পারেন নাই। শূরতান সিংহের অদৃষ্টেও রাজ্যলাভের পর ক্রমাগত নানা দুর্দ্দৈব সহ্য করিতে হইয়াছিল।

শূরতান নিজে বীর, সাহসী এবং সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার উপযুক্ত সৈন্যবল ছিল না বলিয়া, তিনি পদে পদে লাঞ্ছিত হইতেছিলেন। মুসলমানগণ প্রায়ই আসিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ, দুর্গ অবরোধ এবং নগর লুণ্ঠন করিত। অবশেষে শিল নামক একজন দুর্দ্দান্ত প্রতাপশালী আফগান-বীরের আক্রমণ-বেগ তিনি কোনরূপেই রোধ করিতে পারিলেন না। শিল যখন অগণিত আফগান-সেনা লইয়া আসিয়া তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন, তখন নিরুপায় শূরতান বহু রাজপুত-বীরের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোথা হইতেও

কোন সাড়া পাইলেন না। কারণ রাজপুতনার অবস্থা তখন অতীব শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল। সকলেই শক্তিহীন, সকলেই নিজ নিজ রাজ্য রক্ষার জন্য ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন, কে কাহাকে সাহায্য করিবেন ?

কোথাও কোনও সাহায্য না পাইয়া, শূরতান একাই রণরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। শিল তাঁহাকে পরাজিত করিয়া টোডা রাজ্য অধিকার করিলেন। শূরতান রাজ্যচ্যুত হইয়া—স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইয়া, আরাবল্লীর পাদদেশে অবস্থিত বেদনোর বা বিদ্নর নামক নগরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন এবং অতি দীনভাবে সুখ-দুঃখের ভিতর দিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন।

শূরতান সিংহের এই বিষাদভরা জীবনে একমাত্র সান্ত্বনা ছিল—তাঁহার পরম রূপলাবণ্যবতী কন্যা তারাবাই। তারাবাই সত্য সত্যই তাঁহার সেই ঘোর তামসী দুঃখ-নিশার একমাত্র তারকা,—তাঁহার দুঃখ-কষ্ট ও যাতনার একমাত্র সান্ত্বনা। সময় সময় যখন মনের বেদনায় শোকে দুঃখে ও নিরাশায় তাঁহার হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হইত, তখন তিনি তারাবাইয়ের লাবণ্যময় মুখকমল

দেখিয়া অনেকটা শান্তিলাভ করিতেন। তারাবাই ছিল তাঁহার দুঃখদীর্ণ মরুভূ জীবনের প্রফুল্ল শতদল, জীবনের জীবন, আশার আশা!

তারাবাই রাজনন্দিনী—গৌরবশালী পবিত্র শোলাঙ্কি-কুলের গৌরব-কুসুম, কিন্তু অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাঁহাদের সে পূর্ব্বগৌরবের কোন নিদর্শনই নাই। আজ কোথায় দাসদাসী, রাজপ্রাসাদ—কোথায় রাজ-ঐশ্বর্য্যের বিলাস-সুখ-ভোগ! আজ নির্ব্বাসিত রাজা শূরতান অতি দীনভাবে বেদনোরে দিন যাপন করিতেছেন। শূরতান—কি জানি কি লুব্ধ আশায় কন্যার দিকে চাহিয়া দিন যাপন করিতেছিলেন।

তারাবাই শৈশবে পিতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া পিতার মুখে পিতৃপুরুষগণের গৌরব-কাহিনী শুনিতেন। শুনিতে শুনিতে বালিকা তারার মনে নানা ভাবের উদয় হইত! ধীরে ধীরে যতই বালিকা তারার বয়স বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, ততই তাঁহার জ্ঞানের উদ্রেক হইল। তিনি তখন পিতৃপুরুষগণের পূর্ব্বগৌরব-গরিমার কথা হৃদয়মধ্যে আলোচনা করিয়া এবং আপনাদের বর্ত্তমান অবস্থার বিষয় স্মরণ করিয়া, হৃদয়ে একটা দারুণ অতৃপ্তি অনুভব

করিতেন; কখনও কখনও একাকিনী বসিয়া ঐ সকল কথা চিন্তা করিতে করিতে অধীর হইয়া পড়িতেন—অধীর হইয়া আপনার অদৃষ্টকে শত শত বার ধিক্কার দিতেন।

তারাবাই কিশোর বয়স হইতে এক অভিনব ভাবে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে আরম্ভ করিলেন। রমণীয় বেশভূষার প্রতি তাঁহার ধিক্কার জন্মিল, কমনীয় বেশ-ভূষা ব্যবহারের প্রতি তাঁহার ঘৃণা জন্মিল। তিনি পুরুষের মত বেশ পরিধান করিতে আরম্ভ করিলেন—অশ্বারোহণ-পূর্ব্বক ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া যুদ্ধ-বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিলেন। নিয়ত অভ্যাস ও শিক্ষা দ্বারা তারাবাই এই দুই বিদ্যায় এতদূর নিপুণতা লাভ করিয়াছিলেন যে, অতি দ্রুতবেগে অশ্বচালনা করিতে এবং অব্যর্থ সন্ধানে বাণ নিক্ষেপ করিতে তাঁহার সমকক্ষ আর কেহই ছিল না।

রাও শূরতানও নীরবে চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন না। কেমন করিয়া পুনরায় তোডাতঙ্ক উদ্ধার করিবেন, ইহাই ছিল তাঁহার একমাত্র চিন্তা। ইতিমধ্যে তিনি আরও কয়েকবার তোডাতঙ্ক উদ্ধার করিবার জন্য মনোযোগী হইয়াছিলেন। তিনি যে-কয়বার তোডাতঙ্ক উদ্ধার করিতে

চেষ্টা করিয়াছিলেন, সে-কয়বারই তারাবাই ঘোটকে আরোহণ করিয়া, রণস্থলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং প্রাণপণে পিতার সাহায্য করিয়াছিলেন। তারাবাইয়ের অপূর্ব্ব রণ-নৈপুণ্যের কাছে অনেক সুদক্ষ সেনাপতিও লজ্জা পাইয়াছিলেন। তাঁহার অব্যর্থ শরসন্ধানে অনেক আফগান-বীর পরলোক গমন করিয়াছিলেন। এই তরুণী বীরাঙ্গনার অদ্ভুত বীরত্বের কাহিনী ক্রমে সমস্ত রাজপুতনায় প্রচারিত হইয়াছিল।

অনেক রাজপুত-বীর এই রমণীরত্নকে বিবাহ করিবার জন্য উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু শূরতান পণ করিয়াছিলেন—"যে রাজপুত-বীর মুসলামনদের হাত হইতে তোডাতঙ্ক উদ্ধার করিতে পারিবেন, তিনিই তারাবাইর পাণিগ্রহণ করিতে পারিবেন।" এই পণের কথা প্রচারিত হইবার পর যাঁহারা ভীরু ও দুর্ব্বল, তাঁহারা একে একে তারাকে লাভ করিবার আশা হৃদয় হইতে দূর করিলেন; আর যাঁহারা প্রকৃত বীরপুরুষ কেবল তাঁহারাই এইরূপ পণ-বাক্যে উৎসাহিত হইয়া রণভেরীর ভৈরবনাদে চারিদিক্ মুখরিত করিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সে-সময়ে মেবারে রাণা রায়মল্ল রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার পরাক্রমশালী তিন পুত্র ছিলেন—তাঁহাদের নাম সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল। সঙ্গ ও পৃথ্বীরাজের নাম ভারতের ইতিহাসে বিশেষ প্রসিদ্ধ। সঙ্গ মোগল-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বীরবর বাবরের প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজ সময়ে ভারতের অদ্বিতীয় বীররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কনিষ্ঠ জয়মল্লও বীর ছিলেন, কিন্তু তিনি কোনও স্থায়ী কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতে পারেন নাই।

এই তিন ভ্রাতার মধ্যে যদি পবিত্র সৌভ্রাত্র থাকিত, তাহা হইলে ভারতবর্ষ সে-যুগেই বিদেশীর হাতে নিপতিত হইত কিনা তাহা বিশেষ সন্দেহস্থল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এ তিন ভাইয়ের মধ্যে স্নেহ ও ভালবাসা একেবারেই ছিল না। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি পরস্পরে বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন হইয়া পরস্পরের বুকের রক্ত পান করিবার জন্য দৃঢ়ব্রত হইয়াছিলেন।

তাঁহাদের এইরূপ আত্ম-কলহে রাণা রায়মল্লের জীবন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল, তাঁহার প্রাণে একেবারেই কোন শান্তি ছিল না। রাজ্যের সুখ-শান্তিও এইরূপ আত্ম-কলহে একরূপ অন্তর্হিত হইয়াছিল। চারিদিকে বিবিধ অশান্তি ও অসংখ্য বিপদ্ প্রতিমুহূর্ত্তে নানারূপ বিভীষিকা প্রদর্শন করিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল।

তিন ভ্রাতার মধ্যে যাহাতে কোনরূপ কলহ ও বিদ্বেষ না থাকে—তিনজন মিলিত হইয়া যাহাতে রাজ্যের মঙ্গলের জন্য আত্মশক্তি নিয়োগ করেন, সেজন্য রায়মল্ল প্রাণপণ চেষ্টা-যত্ন করিয়াও যখন কোনরূপ ফল পাইলেন না, তখন তাঁহার ক্রোধ উদ্দীপ্ত হইল। তিনি দেখিলেন যে, তাঁহার তিন পুত্রই সমানভাবে অপরাধী, তিনজনেই সমান কলহপ্রিয়; সুতরাং রাজ্যের অশান্তি দূর করিবার জন্য তিনি পুত্রদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন।

জ্যেষ্ঠ পুত্র সঙ্গ পিতার মুখ হইতে নির্ব্বাসন-বাণী শুনিবার পূর্ব্বেই আত্মজীবন রক্ষার জন্য দেশ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। পৃথ্বীরাজ স্বীয় ঔদ্ধত্যের জন্য পিতা কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিত হইলেন। কনিষ্ঠ জয়মল্ল অকালে প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার মৃত্যু-কাহিনী পরে বলিতেছি।

সঙ্গ ও পৃথ্বীরাজ দুই সহোদর। তাঁহাদের মাতা ঝালবংশীয়া। জয়মল্ল তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। পৃথ্বীরাজ ও সঙ্গ দুইজনের চরিত্র আলোচনার যোগ্য। দুইজনই বীর, সাহসী ও বুদ্ধিমান্ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তবে দুইজনের চরিত্রের মধ্যে আবার একটা ভীষণ পার্থক্যও দৃষ্ট হইত।

সঙ্গ যখন যে কার্য্য করিতেন, তাহা বিশেষ বিবেচনা করিয়া সম্পন্ন করিতেন—সহসা কোনও কার্য্য করিয়া ফেলিতেন না। পৃথ্বীরাজের চরিত্র সেইরূপ ছিল না, তিনি সতত যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত, মুহূর্ত্তের জন্যও অসি কোষ-বদ্ধ করিয়া রাখিতে ভালবাসিতেন না। তিনি সর্ব্বদা বলিতেন—"আমি অসির সাহায্যে বিপদের পথ পরিষ্কার করিয়া মেবারের শাসনকর্ত্তা হইব, বিধাতা আমাকে মেবারের শাসনকর্ত্তা করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছেন।"

সঙ্গ জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পৃথ্বীরাজের অগ্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন; সেই হিসাবে চিতোরের সিংহাসন ন্যায়তঃ তাঁহারই প্রাপ্য, কিন্তু পৃথ্বীরাজ এবিষয়ে ভয়ানক বিরোধী ছিলেন। উদ্ধতস্বভাব পৃথ্বীরাজ কোনরূপ প্রীতিবন্ধনের মধ্যে আসিতে একেবারেই চাহিতেন না। কাজেই কে চিতোর-সিংহাসন

অধিকার করিবে, তাহা লইয়া রাণা রায়মল্লের তিনপুত্রের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। প্রত্যেকেই আপন আপন স্বার্থের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন।

রায়মল্লের এক ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহার নাম ছিল সূর্য্যমল্ল। সূর্য্যমল্ল এই তিন ভ্রাতাকেই অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। এই তিন ভ্রাতার মধ্যে যাহাতে কলহ না ঘটিতে পারে সেজন্য সূর্য্যমল্লও প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও এই অন্তর্বিপ্লব নিবারণ করিতে সমর্থ হইলেন না।

একদিন তিন ভ্রাতা চিতোরের উত্তরাধিকারত্ব লইয়া নানা প্রকার তর্ক করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সূর্য্যমল্লের বাড়ীতেই এইরূপ আলোচনা চলিতেছিল।

সঙ্গ বলিলেন,—"আমি সকলের চেয়ে বয়সে বড়, কাজেই ন্যায়তঃ আমিই মিবারের দশ সহস্র নগরের উত্তরাধিকারী; কিন্তু তোমরা অন্যায়রূপে আমার স্বার্থের বিরোধী হইতেছ! এখন সহজেই এই বিবাদের মীমাংসা হয়, যদি তোমরা 'নাহরা মুগরায়'* চারণীদেবীর পরিচারিকা যোগিনীর গণনার উপর বিশ্বাস স্থাপন কর।

* 'নাহরা মুগরা' উদয়পুরের পাঁচক্রোশ পূর্ব্বে অবস্থিত।

তাহা হইলে সহজেই গোলযোগ নিষ্পত্তি হইয়া যায়। যদি তোমরা আমার এ প্রস্তাবে সম্মত হও, তাহা হইলে চল তাঁহার নিকট গমন করি। তবে তোমরা পূর্ব্বাহ্নেই প্রতিজ্ঞা কর যে, তিনি যাহাকে মনোনীত করিবেন,— তিনিই চিতোর-সিংহাসন প্রাপ্ত হইবেন।”

সকলে তাঁহার কথায় সম্মত হইয়া চারণীদেবীর মন্দিরে গমন করিলেন।

চারিদিকে ধূসর পর্ব্বত-শ্রেণী মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্থানটি অতীব নির্জ্জন। এক নির্জ্জন পর্ব্বত-গুহার অভ্যন্তরে চারণীদেবীর মন্দির অবস্থিত। সেই মন্দির-মধ্যে প্রবেশ করিয়া পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল একখানা মাদুরের উপর উপবেশন করিলেন। সম্মুখে একখানি ব্যাঘ্রচর্ম্ম ছিল, তাহার উপর সঙ্গ উপবেশন করিলেন। সূর্য্যমল্ল সেই ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনের উপর আপনার একটি জানু স্থাপন করিয়া উপবেশন করিলেন।

পৃথ্বীরাজ যোগিনীর নিকট তাঁহাদের আসিবার কারণ বিবৃত করিবামাত্র যোগিনী ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে উপবিষ্ট সঙ্গের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। এই অঙ্গুলিনির্দ্দেশ দ্বারা ইহা সুস্পষ্ট বুঝা গেল যে, সঙ্গ ভবিষ্যতে চিতোরের

রাণা হইবেন, আর সূর্য্যমল্ল সেই রাজত্বের কিয়দংশ ভোগ করিবেন ; যোগিনী তাহাই বলিলেন।

পৃথ্বীরাজ যোগিনীর এইরূপ নির্দ্দেশে ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কোষ হইতে অসি উন্মুক্ত করিয়া যোগিনীকে ও সঙ্গকে বধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন,—সূর্য্যমল্ল মধ্যবর্ত্তী হইয়া পৃথ্বীরাজের সেই আক্রমণ-গতি প্রতিরোধ করিয়া দিলেন।

যোগিনী নিরুপায় হইয়া তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। এদিকে সূর্য্যমল্লের সাহায্যে সঙ্গের জীবন রক্ষা পাইল দেখিয়া, পৃথ্বীরাজ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং প্রবল পরাক্রমে সূর্য্যমল্লকে আক্রমণ করিলেন।

পৃথ্বীরাজ ও সূর্য্যমল্ল দুইজনে দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। দ্বন্দ্বযুদ্ধ সহজে নিবৃত্ত হইল না। উভয়েই অসংখ্য আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হইলেন। অনর্গল ধারায় রক্তস্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সঙ্গও একটি শর ও পাঁচটি তরবারির আঘাত পাইয়া সেস্থল হইতে পলায়ন করিলেন। শরের আঘাতে তাঁহার একটি চক্ষু নষ্ট হইয়া গেল। দ্বন্দ্বস্থান হইতে

পলায়ন করিয়া সঙ্গ, বীদা নামক একজন রাজপুতের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।

বীদা শিবাস্তি নামক নগরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বিদেশ যাত্রায় প্রস্তুত হইয়া আপনার সজ্জিত অশ্বোপরি আরোহণ করিতে যাইতেছেন, এরূপ সময়ে ক্ষতবিক্ষত-দেহে সঙ্গ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া আশ্রয় চাহিলেন।

বীদা অতি সদাশয় ব্যক্তি ছিলেন; সঙ্গের এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত দ্রবীভূত হইলেন এবং তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে অবতরণপূর্ব্বক তাঁহাকে সাদরে আলিঙ্গন করিয়া গ্রহণ করিলেন।

ইতিমধ্যে জয়মল্ল তড়িৎগতিতে অশ্বারোহণে সেখানে উপস্থিত হইয়াই সঙ্গকে আক্রমণ করিলেন।

আশ্রিত সঙ্গকে রক্ষা করিবার জন্য বীদা জয়মল্লের আক্রমণ ব্যর্থ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শরণাগতের জীবন রক্ষা করিতে যাইয়া বীদা আত্মজীবন বিসর্জ্জন করিলেন। এই সুযোগে সঙ্গ অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণের জন্য পলায়ন করিলেন।

এদিকে পৃথ্বীরাজ আরোগ্য লাভ করিয়া শরীরে পুনরায় বল পাইয়াই অগ্রজ ও প্রতিদ্বন্দী সঙ্গের

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। সঙ্গও এ-বিষয় জানিতে পারিয়াছিলেন। কাজেই আত্মজীবন রক্ষার জন্য তাঁহাকে ছদ্মবেশে নানা গুপ্তস্থানে বিচরণ করিতে হইয়াছিল।

অজ্ঞাতবাসকালে সঙ্গের ক্লেশের অবধি ছিল না। যে সঙ্গ রাজপুত্র—চিতোরের সিংহাসনের ভাবী উপযুক্ত উত্তরাধিকারী, আজ তাঁহার কি শোচনীয় দুর্দ্দশা! আজ তিনি নির্ব্বাসিতের ন্যায় অতি দীনভাবে বনে বনে—নির্জ্জন প্রান্তরে—পর্ব্বতগুহায় বনফল ভোজনে এবং কখনও বা অনাহারে ও অনিদ্রায় জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন।

এইভাবে আর কতদিন চলিতে পারে? নিরুপায় হইয়া সঙ্গ এসময়ে কতকগুলি ছাগপালকের নিকট যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। সঙ্গ রাজপুত্র, তাই তিনি ছাগপালকদের মত ছাগল চরাইতে পারিতেন না। কাজেই ছাগপালকেরা তাঁহাকে নানাভাবে নির্য্যাতন করিত—কোন কোন দিন বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দিতে চাহিত। পুনরায় সঙ্গ অনুরোধ-উপরোধ করিয়া তাহাদের ওখানেই থাকিতেন।

ছাগপালকেরা যখন দেখিতে পাইল যে, সঙ্গ ছাগল চরাইতে একান্ত অক্ষম, তখন তাহারা তাঁহাকে গোধুম-

চূর্ণের পিষ্টক প্রস্তুত করিবার ভার অর্পণ করিল। কিন্তু তিনি একার্য্যেও অপারগ হওয়ায় রাখালেরা প্রতিনিয়ত তাঁহাকে নানাভাবে উপহাস করিয়া বলিত, "তুমি ত বেশ লোক হে, খাইতে জান, তৈয়ারী করিতে জান না!" এই-ভাবে সঙ্গের দিন যাইতে লাগিল।

একদা কয়েকজন রাজপুত আসিয়া তাঁহাকে কতকগুলি অস্ত্রশস্ত্র ও একটি ঘোটক প্রদান করিল এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আজমীরের নিকটবর্ত্তী শ্রীনগর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া রাও করিমচাঁদ নামক একজন সর্দ্দারের নিকট অর্পণ করিল। করিমচাঁদ ছিলেন দস্যু-ব্যবসায়ী। করিমচাঁদের দলে আসিয়া, সঙ্গ তাহাদের ন্যায় দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিলেন!

প্রত্যহই তাহারা লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত। একদিন লুণ্ঠনের পর সঙ্গ শ্রান্তি দূর করিবার জন্য একটা বটবৃক্ষের ছায়াতলে শয়ন করিয়াছেন। সকোষ তরবারি হইয়াছে তাঁহার উপাধান। শ্রান্ত সঙ্গ গভীর নিদ্রায় নিমজ্জিত হইয়াছেন। বৃক্ষের অপরদিকে দুইজন বিশ্বস্ত অনুচর তাঁহার জন্য আহার্য্য প্রস্তুত করিতেছে। অশ্ব তিনটি স্বচ্ছন্দে প্রান্তরমধ্যে চরিয়া বেড়াইতেছিল।

সেই বিরাট বনের ঘন পাতার ভিতর দিয়া সূর্য্যরশ্মি নিদ্রিত সঙ্গের মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছিল। সেই সময়ে একটি বৃহৎ ভুজঙ্গ সঙ্গের মাথার উপর আপনার বিস্তৃত ফণা ধীরে ধীরে উত্তোলন করিতেছিল। মার নামক একজন অজপালক এই দৃশ্য দেখিয়াছিল এবং সঙ্গ জাগরিত হইলে তাঁহাকে সমুচিত রাজসম্মান প্রদান করিল। কিন্তু চতুর সঙ্গ কৃত্রিম ক্রোধের সহিত তাহার প্রণাম ও বন্দনা অস্বীকার করিলেন।

মার—করিমচাঁদকে এই আশ্চর্য্য বিষয়ের কথা যথা-সময়ে জ্ঞাপন করিলে করিমচাঁদ সমস্ত বিষয় গোপন রাখিয়া সঙ্গের সহিত আপনার কন্যার বিবাহ দিলেন এবং যতদিন পর্য্যন্ত সঙ্গ পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিতে না পারেন ততদিন পর্য্যন্ত তাঁহাকে নিজ বাসভবনে অতি যত্নসহকারে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

এই ভ্রাতৃবিরোধের কথা অতি অল্পদিনের মধ্যেই রায়মল্ল শুনিতে পাইলেন। পৃথ্বীরাজের দুর্ব্যবহারে তাঁহার প্রকৃত উত্তরাধিকারী সঙ্গের প্রাণ বিনষ্ট হইতে চলিয়াছিল, একথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হইলেন। তিনি পৃথ্বীরাজকে আহ্বানপূর্ব্বক তাঁহার

ঐরূপ অন্যায় আচরণের জন্য তিরস্কার করিয়া কহিলেন,—"তুমি আমার রাজ্য হইতে দূর হইয়া যাও। তুমি যেরূপ উদ্ধত, সাহসী ও কলহপ্রিয় তাহাতে তুমি অনায়াসে আত্মজীবিকা অর্জ্জন করিয়া দিনাতিবাহিত করিতে পারিবে।"

তেজস্বী পৃথ্বীরাজ পিতার এই কঠোর বাক্য শ্রবণ করিয়া কেবল পাঁচজনমাত্র অনুচর সঙ্গে লইয়া পিতৃ-রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

পৃথ্বীরাজ আরাবল্লীর পাদদেশে অবস্থিত গদবার প্রদেশের অন্তর্গত নদালয় বা নাদোল নামক নগরে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এই নাদোল নগরের নিকটে ওঝা নামক একজন বণিক্ বাস করিতেন। অর্থ সংগ্রহের জন্য পৃথ্বীরাজ আপনার অঙ্গুরীয়ক সেই বণিকের নিকট বিক্রয় করিয়াছিলেন।

বণিক্ ওঝা ছিলেন নিপুণ জহুরী। একজন সাধারণ লোকের হাতে এইরূপ বহুমূল্য অঙ্গুরীয়ক থাকা কখনই সম্ভবপর নহে, কাজেই অঙ্গুরীয়ক-বিক্রেতা নিশ্চয়ই কোন ছদ্মবেশী রাজা কিংবা রাজপুত্র তাহা তিনি সহজেই অনুমান করিতে পারিয়াছিলেন। পৃথ্বীরাজকে নানারূপ প্রশ্ন করিয়া, বণিক সহজেই তাঁহার পরিচয় জানিতে পারিয়াছিলেন এবং পরে বলিলেন,—"আমি আপনাকে সর্ব্বতোভাবে সাহায্য করিব, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছি।"

পৃথ্বীরাজ বণিকের প্রতিজ্ঞায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাহাকে স্বীয় দলভুক্ত করিয়া লইলেন।

পিতার নিকট তিরস্কৃত হইয়া পৃথ্বীরাজ মনে মনে অত্যন্ত অপমান বোধ করিয়াছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু যেরূপেই হয় রাজ্যলাভ করিবেন।

ঐ সময়ে মীন নামক পার্ব্বত্য জাতি নাদোল নগর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী নানাস্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। গদবার রাজ্য একরূপ এই মীনদের হস্তগত হইয়াছিল। মীনগণ ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশের আদিম অধিবাসী; এবং ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশ চিরদিন তাহাদেরই অধিকারভুক্ত ছিল, কিন্তু কালক্রমে রাজপুতগণ ক্ষমতা-শালী হইয়া বলপূর্ব্বক তাহাদের হস্ত হইতে ঐ সকল পার্ব্বত্য প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন।

মীনগণ পুনরায় সুযোগ পাইয়া বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া গদবার রাজ্য অধিকার করিয়াছিল। 'রাবৎ' উপাধিধারী একজন মীন, রাজা হইয়া নাদোল নগরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত মীনরাজ এতদুর প্রতাপশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, বহু রাজপুত পর্য্যন্ত

তাঁহার অধীনে কাজ করিতেছিল। ওঝার পরামর্শানুসারে পৃথ্বীরাজও তাঁহার দলবল সহ আপনার প্রকৃত পরিচয় গোপন করিয়া অসভ্য মীনদের কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার মনে দৃঢ়পণ ছিল যে—যেরূপেই হউক, গদবার রাজ্য উদ্ধার করিবেন। শীঘ্রই একটি সুযোগও উপস্থিত হইল।

আহেরিয়া বা শবরোৎসব নামে একটি উৎসব মীন-গণের মধ্যে প্রচলিত ছিল। উক্ত উৎসবের সময় মীনরাজার সমুদয় কর্ম্মচারী আত্মীয়-স্বজনগণের সহিত মিলিত হইবার জন্য কিছুদিনের নিমিত্ত অবসর পাইয়া থাকে। পৃথ্বীরাজও এই সুযোগে অবসর পাইলেন এবং এইবার আপনার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য উৎসুক হইয়া উঠিলেন। তিনি নগরের বাহিরে গমন করিয়া আপনার অনুগত রাজপুত-দিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"তোমরা মীনরাজাকে আক্রমণ করিবার এই উত্তম সুযোগ হেলায় হারাইও না।"

পৃথ্বীরাজের নিকট হইতে অনুমতি পাওয়ামাত্র রাজপুতগণ অপ্রস্তুত মীনদিগকে ভীষণভাবে আক্রমণ করিলেন। মীনদের মধ্যে একটা মহা আতঙ্কের সৃষ্টি হইল। তাহারা রাজপুতগণের অতর্কিত আক্রমণের

নিকট মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে পারিল না—প্রাণভয়ে এদিকে-ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

নগরের বাহিরের এক গুপ্তস্থান হইতে পৃথ্বীরাজ এ সকল ব্যাপার দেখিতেছিলেন। বিপ্লব ক্রমে ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিল। মীনদের রাজা বিপদ্ বুঝিয়া আত্মরক্ষার জন্য অশ্বারোহণ করিয়া নগরের বহির্ভাগে গমন করিলেন। পৃথ্বীরাজও এই সুযোগেরই অপেক্ষা করিতেছিলেন। যেমন মীনরাজা বাহির হইলেন, অমনি পৃথ্বীরাজ তাঁহার অনুসরণ করিয়া তাঁহাকে ধৃত করিলেন এবং হতভাগ্য রাজাকে সম্মুখস্থ একটি বন্য বৃক্ষে আপন ভল্ল দ্বারা একেবারে জীবন্ত গাঁথিয়া ফেলিলেন।

এইবার রাজপুতগণ বিজয়-গৌরবে মীন-রাজধানী অধিকার করিলেন। পৃথ্বীরাজ নদালয় ও তৎসন্নিহিত নগর ও পল্লীসমূহ অগ্নিদ্বারা ভস্মীভূত করিলেন। অধিবাসিগণ অগ্নির দারুণ গ্রাস হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য চারিদিকে ছুটাছুটি করিতে লাগিল, কিন্তু কিছুতেই জীবন রক্ষা করিতে পারিল না। এইভাবে মীনগণ পরাজিত হইল—একটিমাত্র দুর্গ ব্যতীত সমুদয় গদবার রাজ্য পৃথ্বীরাজের হস্তগত হইল। পৃথ্বীরাজ

ওঝা ও সর্দ্দার শোলাঙ্কি নামক দুই ব্যক্তির উপর গদবার রাজ্য শাসনের ভার অর্পন করিলেন।

পৃথ্বীরাজের এইরূপ অনন্যসাধারণ বীরত্বের কথা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই রাণা রায়মল্লের কর্ণগোচর হইল। রাণা তখন সন্তুষ্টচিত্তে পুত্রকে মার্জ্জনা করিয়া স্বীয় রাজ্যে ফিরিয়া আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন। পৃথ্বীরাজ পুনরায় পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন! ঐ সময়ে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জয়মল্ল নিহত হওয়ায় তাঁহার সৌভাগ্যের সূত্রপাত হইয়া উঠিল। জয়মল্ল কি ভাবে নিহত হইয়াছিলেন সে-কথা এখানে বলিতেছি।

জয়মল্ল তারাবাইয়ের রূপ ও গুণ-গরিমার কথা শুনিয়া তাঁহাকে লাভ করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন। রাজ্যলাভের আকাঙ্ক্ষাও বুঝি বা পরিত্যাগ করিয়া তিনি সাহসে ভর করিয়া বেদনোরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তারাবাইয়ের পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তারাবাই বীর দম্ভে বলিলেন,—"আপনি আমার পিতৃপ্রতিশ্রুতি মত তোড়া উদ্ধার করুন, তাহা হইলেই আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।"

জয়মল্ল তাহাতেই সম্মত হইলেন। কিন্তু হায়!

তিনি তারাবাইয়ের রূপে এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে, আপনার প্রতিজ্ঞা-রক্ষা না করিয়াই অন্যরূপ উপায়ে তারাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

শূরতান জয়মল্লের এইরূপ কাপুরুষোচিত ব্যবহারে অত্যন্ত অপমান বোধ করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে বধ করিলেন। ভট্ট কবিগণ এবিষয়ের উল্লেখ করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"তারা জয়মল্লের অদৃষ্টাকাশের অনুকূল তারা হইলেন না।"
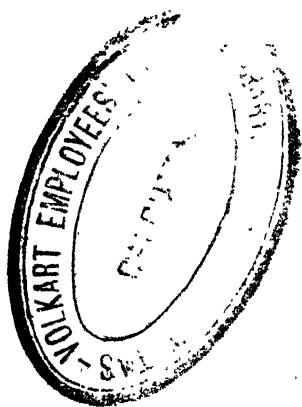
চতুর্থ অধ্যায়

রাণা রায়মল্লের তিন পুত্রের মধ্যে সে সময়ে সঙ্গ অজ্ঞাতবাসে অবস্থান করিতেছিলেন, আর পৃথ্বীরাজ হইয়াছিলেন নির্ব্বাসিত ; সুতরাং সকলেই জয়মল্লকে মিবারের প্রকৃত উত্তরাধিকারী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ঠিক সেই সময়েই জয়মল্ল আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার দরুণ শূরতান কর্ত্তৃক নিহত হইলেন !

জয়মল্ল শূরতান কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছেন, এ-সংবাদ শুনিতে পাইয়া সকলেই মনে করিয়াছিলেন যে, না জানি পুত্রহন্তার প্রতি রায়মল্ল কি ভীষণ ব্যবস্থাই না করেন ! বাস্তবিক এইরূপ ব্যাপারে তাঁহার হৃদয়ে ক্রোধ ও জিঘাংসার উদয় হইবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। কিন্তু রায়মল্ল যে ব্যবস্থা দ্বারা ঐ ব্যাপারের পরিসমাপ্তি করিয়াছিলেন, তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব্ব—তেমন ব্যবস্থা কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই।

সভাসদ্‌গণ জয়মল্লের মৃত্যুর বিবরণ রায়মল্লের নিকট বিবৃত করিয়া বলিলেন,—"মহারাণা, এই পাপিষ্ঠের যথোপযুক্ত শাস্তির বিধান করুন।"

কেহ বলিলেন,—"এই মুহূর্ত্তেই একদল সৈন্য প্রেরণ করিয়া বেদনোর ভূমিসাৎ করিয়া ফেলুন।"

রাণা রায়মল্ল কাহারও কোনরূপ উত্তেজনা-বাণীতেই বিচলিত হইলেন না। তিনি ধীরভাবে সমুদয় অবস্থা জ্ঞাত হইয়া বলিলেন,—"কোন্ দোষে আমি শূরতানের প্রতি কঠোর দণ্ডের বিধান করিব ?"

একজন সভাসদ্ বলিলেন,—"পাপিষ্ঠ বিনা অপরাধে আপনার পুত্রকে হত্যা করিয়াছে, এই অপরাধে।"

রায়মল্ল ধীর-গম্ভীর ভাবে বলিলেন,—"বন্ধু! যদি তোমার গৃহে তোমার কুমারী কন্যার নিকট গভীর নিশীথকালে কোন ব্যক্তি অসদভিপ্রায়ে প্রবেশ করে, তাহা হইলে তুমি তাহার প্রতি কিরূপ ব্যবস্থা কর ?"

—"সেই দণ্ডে সেই পাপিষ্ঠের তপ্ত শোণিতধারায় হৃদয়ের অরুন্তুদ-জ্বালা নির্ব্বাণ করিয়া থাকি।"

—"ইহাও যে সেইরূপ বন্ধু! যে মূর্খ অযোগ্য অনুষ্ঠান দ্বারা একজন সম্ভ্রান্ত—বিশেষতঃ বিপন্ন রাজ-পুতকে অপমানিত করিবার চেষ্টা করিয়াছিল, সে আপনার দুরাচরণের উপযুক্ত প্রতিফল পাইয়াছে।"

রাণা রায়মল্লের এইরূপ মাহাত্ম্যসূচক বাক্য শ্রবণ করিয়া সভাসদ্গণ নীরব রহিলেন। রায়মল্ল শুধু এইরূপ বাক্য উচ্চারণ করিয়াই ক্ষান্ত রহিলেন না, তিনি শোলাঙ্কি-

সর্দ্দার শূরতানকে বেদনোর জনপদ বৃত্তিস্বরূপ দান করিলেন।

জয়মল্ল যখন শূরতানের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে পৃথ্বীরাজ মারবারে নির্ব্বাসিত অবস্থায় বাস করিতেছিলেন; কিন্তু ঐ অবস্থায় যে তাঁহাকে বেশী দিন থাকিতে হইল না, সে-কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মীনদিগকে পরাজিত করিয়া গদবার রাজ্য উদ্ধার করায় তিনি পিতার স্নেহচক্ষে পতিত হইয়াছিলেন এবং সেইজন্যই রায়মল্ল তাঁহাকে পুনরায় নিজ রাজ্যে আনয়ন করাইলেন।

পৃথ্বীরাজের অসীম বীরত্বের কথা এ-সময়ে সমুদয় রাজস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। রূপলাবণ্যবতী তারা পৃথ্বীরাজের অতুল বীরত্বের কথা শ্রবণ করিয়া মনে মনে তাঁহাকেই পতিত্বে বরণ করিয়া তাঁহার দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় দিন গণিতেছিলেন। আর এদিকে পৃথ্বীরাজও দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বীরনারী তারার কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। পৃথ্বীরাজ পণ করিলেন—"যেরূপেই হয় তারাকে লাভ করিব।" এইরূপ কল্পনা হৃদয়ে লইয়া তিনি বেদনোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

———

পঞ্চম অধ্যায়

শূরতান ও তারাবাই—পিতা ও পুত্রী দুইজনেই পৃথ্বীরাজের অদ্ভুত বীরত্বের কথা শুনিয়া তাঁহার গুণের একান্ত অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিলেন। শূরতান ভাবিতেছিলেন, যদি পৃথ্বীরাজ তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তোডাতঙ্ক উদ্ধারের পথ প্রশস্ত হইবে। আর তারা—বীরনারী তারা—মনে মনে ভাবিতেছিলেন—পৃথ্বীরাজই তাঁহার একমাত্র আরাধ্য দেবতা—তাঁহার স্বামী। যদি জীবন-যৌবন সমর্পণ করিতে হয় তবে এইরূপ বীরের করেই সমর্পণ করা উচিত। এইরূপ ভাবে তাঁহারা দুইজনেই পৃথ্বীরাজের আগমন-প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময়েই তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে, পৃথ্বীরাজ বেদনোরে আসিতেছেন। তাহাতে রাও শূরতান এবং তারাবাই উভয়েই সন্তুষ্ট হইলেন।

যে-দিন পৃথ্বীরাজ বেদনোরে আসিলেন, সে-দিন তাঁহাকে শূরতান সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। পৃথ্বীরাজের আগমনে বেদনোরে আনন্দ-স্রোত প্রবাহিত হইল। পৃথ্বীরাজ তারাকে দেখিলেন—তারাও পৃথ্বীরাজকে দেখিলেন।

উভয়ে উভয়কে দেখিয়া এক স্বর্গীয় আনন্দে বিভোর হইলেন। পৃথ্বীরাজ দেখিলেন—অপূর্ব্ব রূপলাবণ্যবতী তেজস্বিনী তারার দেহে স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য প্রতিভাত—তারা যেন এ পৃথিবীর নহে—যেন অপ্সরালোকের স্বপ্ন-ছবি! আর তারা দেখিলেন—কামদেবের ন্যায় রূপবান, ইন্দ্রের মত বজ্রধারণশক্তি-সম্পন্ন ও গাণ্ডীবধারী অর্জ্জুনের ন্যায় বীরপুরুষ পৃথ্বীরাজ—তাঁহাকে গ্রহণ করিবার জন্য উপনীত হইয়াছেন। তারা বসন্তের পুষ্পিত-কানন-সম্ভারের অপূর্ব্ব মাধুরী-ডালার মত যৌবনের কমনীয় অর্ঘ্য-ডালা লইয়া প্রিয়তমকে সাদরে অভিনন্দিত করিলেন। উভয়ে উভয়কে প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া লইলেন।

পৃথ্বীরাজ শূরতানকে বলিলেন,—"দেব! আপনি কোনও চিন্তা করিবেন না। আমি শীঘ্রই মুসলমানদিগকে তোডাতঙ্ক হইতে দূর করিয়া দিতেছি। দেখিবেন এক সপ্তাহ পরে তোডা নগরে একজন মুসলমানও বিদ্যমান থাকিবে না।"

শূরতান বলিলেন,—"বৎস! একলিঙ্গদেব তোমার সহায় হউন। তোমার করে তারাকে সমর্পণ করিয়া সুখী হই—ইহাই আমার প্রাণের কামনা।"

বিদায়কালে পৃথ্বীরাজ পুনরায় লাবণ্যবতী তারাবাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে প্রেমবিগলিত কণ্ঠে কহিলেন,—"সুন্দরি ! তোমাকে লাভ করিবার জন্যই আমি এই কঠোর কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে সাহসী হইয়াছি। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিও যেন আমি সফলকাম হইতে পারি—আশায় নিষ্ফল না হই।"

তারাবাই বীণাবিনিন্দিত স্বরে কহিলেন,—"বীরবর ! এ হৃদয় আপনারই, আপনার জন্যই অনেক যন্ত্রণা ও ক্লেশ সহ্য করিয়াও ইহা এখনও অটুট রহিয়াছে। এক্ষণে নিবেদন, যে কঠোর ব্রত ধারণ করিলেন, সে ব্রত সুসম্পন্ন করিবার জন্য উদ্যোগী হউন,—মুসলমানদিগকে দূর করিয়া দিয়া—প্রকৃত রাজপুত-বীরের পরিচয় প্রদান করুন, তবেই এই দাসী ধন্য হইবে।"

পৃথ্বীরাজ সে-দিনই বিদায় লইয়া পিতৃরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন এবং মন্ত্রসাধনের উপযুক্ত অবসরের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যবশতঃ অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সেই সুযোগ আসিয়া উপস্থিত হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

'মহরম' মুসলমানদের একটি জাতীয় পর্ব্ব। শিয়া, সুন্নি উভয় সম্প্রদায়ের মুসলমানেরাই এই পর্ব্বের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এখানে মহরমের একটু সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বলিয়া লইতেছি।

আলি ইসলামধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক হজরত মহম্মদের জামাতা। তাঁহার দুই পুত্র—হাসান ও হোসেন। ইঁহারা হজরত মহম্মদের দুহিতা ফতেমার গর্ভজাত—স্বয়ং পয়গম্বরের দৌহিত্র।

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর পর সর্ব্বসম্মতিক্রমে তাঁহার প্রবীণ ও প্রিয়তম শিষ্য আবুবকর খলিফা অর্থাৎ প্রতিনিধি নির্ব্বাচিত হন। আবুবকর হজরত মহম্মদের বংশীয় নহেন। এক সম্প্রদায়ের মুসলমানের ইচ্ছা ছিল—হজরত মহম্মদের বংশীয় লোক ব্যতীত অপরের খলিফা হওয়া ঠিক নহে। কাজেই মহাত্মা আবুবকর খলিফা নির্ব্বাচিত হওয়ায় সে সম্প্রদায়ের লোকেরা আপত্তি উত্থাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু মহাত্মা আলি নিজে আবুবকরের মনোনয়নে কোনরূপ বাদী না হওয়ায় আর কোন গোলযোগ হয় নাই। কাজেই যথাক্রমে আবুবকরের

পর ওমর এবং ওমরের পর ওসমান খলিফা হন। আলির পক্ষপাতী কেহ ইহাতে বাদী না হওয়ায় অত্যন্ত শান্তির সহিত ইস্‌লাম-সমাজের কার্য্যাদি সুপরিচালিত হইয়াছিল।

ওসমানের পর আলি খলিফা-পদে বৃত হইলেন। যাঁহারা আলির পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারা এইবার বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন, তাঁহাদের মনে হইয়াছিল, প্রকৃত ধর্ম্মানুমোদিত খলিফা ইনিই হইলেন।

হজরত মহম্মদ কোরেশ সম্প্রদায় বা গোত্রের হাসিম-বংশীয় ছিলেন। এই গোত্রের অপর বংশীয়েরা এই বংশীয়দিগকে বরাবর ঘৃণা করিতেন, ইহারা উম্মেয়াবংশীয়। এই সময়ে মুসলমান-সম্প্রদায়ের রাজ্য আরবের বাহিরেও বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এক্ষণে হাসিমবংশীয়গণের ক্রমোন্নতি দর্শনে উম্মেয়াবংশীয়দের বিদ্বেষ-বহ্নি জ্বলিয়া উঠিল। তাহার ফলে সিরিয়া প্রদেশের শাসনকর্ত্তা উম্মেয়া-বংশীয় মাবিয়া, আলির প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া নিজেকে খলিফা বলিয়া প্রচার করেন এবং বিবিধ কূটনীতির প্রভাবে কৌশল করিয়া আলিকে নিহত করেন।

যাঁহারা আলির পক্ষপাতী ছিলেন, ইরাক অঞ্চলের সে-সকল মুসলমান আলির জ্যেষ্ঠ পুত্র হাসানকে খলিফা

করিলেন। হাসান অতি শান্তপ্রকৃতির লোক ছিলেন। কলহ-নিবৃত্তির জন্য তিনি খলিফার পদ পরিত্যাগ করিলেন এবং উম্মেয়াবংশীয় মাবিয়ার সহিত এইরূপ সন্ধি করিলেন যে, মাবিয়া জীবিতকাল পর্য্যন্ত খলিফা থাকিবেন, তাঁহার মৃত্যুর পর হাসানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হোসেন খলিফার পদে বৃত হইবেন। এইরূপ সন্ধি করিয়া হাসান মদিনায় যাইয়া রহিলেন।

ঐ ঘটনার কয়েক বৎসর পর হাসানের মৃত্যু হইল। অনেকে মনে করেন যে, মাবিয়ার পুত্র ইয়াজিদই বিষ-প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করেন। মাবিয়া কিন্তু সন্ধি-পালনের কোন ব্যবস্থাই করেন নাই; বরং তাঁহার কৌশল-প্রভাবে, তাঁহার মৃত্যুর পর ইয়াজিদই পিতার উত্তরাধিকারী হইলেন।

হোসেন তখন মদিনায় ছিলেন, ইয়াজিদের অত্যাচারে তিনি মক্কায় পলাইয়া আসেন এবং সেখান হইতে ইরাক প্রদেশে গমন করেন। ইরাকবাসীরা তাঁহাকে খলিফাপদ-লাভে সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়া-ছিল, কিন্তু পরে তাহারা উপযুক্ত সাহায্য করিল না।

এদিকে ইয়াজিদের এক সেনাপতি বহু সৈন্য লইয়া

হোসেনের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। নিরুপায় হোসেন স্বীয় পুত্র-পরিবার সহ শত্রুর সম্মুখীন হইতে চলিলেন এবং জনৈক বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে ইরাকের অন্তর্ব্বর্ত্তী কারবালা-নামক ভীষণ মরুপ্রান্তরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

সেই মরুপ্রান্তরেই উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। ইয়াজিদের সৈন্যগণ কারবালা অবরুদ্ধ করিল। তুমুল সংগ্রামের পর পিপাসার্ত্ত হইয়া, একবিন্দু জলের জন্য হাহাকার করিতে করিতে মহাত্মা হোসেন স্বীয় সহচরগণ সহ মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। হোসেনের পত্নী তাঁহার একটি মাত্র শিশুপুত্রকে লইয়া কোনরূপে মদিনায় পলাইয়া গিয়া জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন।

মহরম মাসের যে তারিখে এই শোচনীয় দুর্ঘটনা হয় প্রতি বৎসর সেই তারিখে মুসলমানগণ পয়গম্বরের দৌহিত্রের মৃত্যুর শোকাভিনয় করিয়া থাকেন। কারবালা-প্রান্তরে হাসান ও হোসেনের যে সমাধি-মন্দির আছে তাহার অনুকরণে তাঁহারা 'তাজিয়া' তৈয়ার করেন এবং তাহা লইয়া হাসান ও হোসেনের নামোচ্চারণ করিয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে রাস্তা

দিয়া চলিতে থাকেন। এইভাবেই পর্ব্ব অনুষ্ঠিত হয়। মহরম-পর্ব্বের ইহাই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

*　　　*　　　*

মুসলমানদিগের এই মহরম-পর্ব্বের সময় নিকটে সমাগত হইলে পৃথ্বীরাজ পাঁচশত অশ্বারোহী সৈনিক লইয়া তোডাতঙ্ক অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া বীরাঙ্গনা-বেশে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন।

পৃথ্বীরাজ যখন তোডাতঙ্ক নগরে উপস্থিত হইলেন, তখন মুসলমানগণ 'তাজিয়া' লইয়া মহাসমারোহে দুর্গ হইতে বাহির হইতেছিল। তাঁহাদিগকে সদলবলে দেখিতে পাইয়াও মুসলমানেরা কোনও সন্দেহ করিল না। কাজেই পৃথ্বীরাজ দলবল সহ বিনা বাধায় অগ্রসর হইতে লাগিলেন। যথারীতি-কোলাহলের মধ্যে 'তাজিয়া' ধীরে ধীরে প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া বাহির হইয়া গেল।

দুর্গদ্বার দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়া পৃথ্বীরাজ দেখিলেন—রাজপ্রাসাদের বারান্দার উপর মুসলমান নৃপতি বেশভূষা পরিধান করিতেছেন। নিতান্ত অপরিচিত অশ্বারোহীদিগকে দেখিতে পাইয়া নৃপতি একটু বিস্মিত

হইলেন এবং মনের মধ্যে নানারূপ তর্কবিতর্ক করিতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার মনে ভীষণ সন্দেহের উদয় হইল। তিনি অপরিচিত রাজপুত-বীরগণের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে যাইবেন, মনে মনে এইরূপ সঙ্কল্প করিতেছিলেন, এমন সময়ে বীরাঙ্গনা তারা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একটি তীর নিক্ষেপ করিলেন। ঠিক সেই সময়ে পৃথ্বীরাজও হস্তস্থিত ভীষণ শূল নিক্ষেপ করিলেন। পলকমধ্যে আফগানরাজের জীবনদীপ নির্ব্বাপিত হইল।

আফগানরাজের আকস্মিক মৃত্যুতে মুসলমানগণের মধ্যে একটা মহা হুলুস্থূল পড়িয়া গেল। সকলেই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া এদিকে ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিল—রাজপুতগণের আকস্মিক আক্রমণের গতি প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা না করিয়া সকলেই আত্মরক্ষার জন্য বিব্রত হইয়া পড়িল।

পৃথ্বীরাজ ও তারাবাই এই সুযোগে মুসলমানদের উপরে ভীষণবেগে নিপতিত হইলেন এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিলেন। এই ভাবে তাঁহারা অগণিত মুসলমান সেনার প্রাণনাশ করিতে করিতে নগরের তোরণদ্বার-সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত

হইলেন; কিন্তু নির্ব্বিঘ্নে তোরণ-মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিলেন না। একটা প্রচণ্ড হস্তী তাহার বিকট শুণ্ড আস্ফালন করিয়া দ্বারপথ অবরুদ্ধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। বীরাঙ্গনা তারা অসাধারণ সাহসিকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের প্রভাবে একখানি তীক্ষ্ণ তরবারি লইয়া অচিরে সেই মত্ত মাতঙ্গের শুণ্ড ছেদন করিয়া ফেলিলেন। বিকট শব্দ করিয়া সেই প্রচণ্ড হস্তী তোরণ-দ্বার পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল।

মুসলমানগণ কিছুক্ষণের মধ্যে কতকটা জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিল—এইবার তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদের ভীষণ দুর্দ্দৈব উপস্থিত। তখন তাহারা অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিল এবং ভীমবিক্রমে পৃথ্বীরাজকে আক্রমণ করিল।

আবার দুই পক্ষে ভীষণ যুদ্ধ বাধিয়া গেল। পৃথ্বীরাজ অসীম বিক্রমের সহিত মুসলমানদিগকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন—মুসলমানেরা কোনরূপেই আত্মরক্ষা করিয়া দাঁড়াইতে পারিল না—তাহারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া এদিকে ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিল। কিন্তু হায়! পলায়ন করিয়া তাহারা কোথায়

যাইবে ? কোথায় তাহাদের আশ্রয় ? কে তাহাদিগকে পৃথ্বীরাজের ভীষণ আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবে ? মুসলমানেরা যে-দিকে পলায়ন করিতে লাগিল, সে-দিকেই পৃথ্বীরাজ ও তাঁহার অনুচরগণ সবেগে ধাবিত হইলেন এবং তাহাদের উপর নিপতিত হইয়া তাহাদিগকে বধ করিলেন। যাহারা কোনরূপে প্রাণরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা আর যুদ্ধের উদ্যম করিল না।

পৃথ্বীরাজের এইরূপ অসীম বীরত্ব-প্রভাবে তোডাতঙ্কের উদ্ধারকার্য্য সাধিত হইল—শূরতানের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইল। তোডাতঙ্ক উদ্ধার করিয়া পৃথ্বীরাজও তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত পত্নী লাভ করিলেন। মণি-কাঞ্চনের সংযোগ হইল। উভয়ের মনোবাসনা পূর্ণ হইল। আবার বহুকাল পরে শূরতানের ম্লানমুখে হাসির রেখা ফুটিয়া উঠিল।

পৃথ্বীরাজ ও তারাবাইয়ের প্রশংসা-বাণীতে চারিদিক মুখরিত হইল। সকলেই একবাক্যে বলিলেন,—"বীর পৃথ্বীরাজের যোগ্য সহধর্ম্মিণী লাভ হইয়াছে।"

সপ্তম অধ্যায়

পৃথ্বীরাজ তারাবাইকে লাভ করিয়া সুখী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অদৃষ্টাকাশে ধীরে ধীরে কাল মেঘ সঞ্চিত হইতে লাগিল। যে বিপ্লবের মধ্যে পড়িয়া সঙ্গ, পৃথ্বীরাজ ও জয়মল্ল ভিন্ন ভিন্ন দিকে সরিয়া পড়িয়াছিলেন, চতুর সূর্য্যমল্লই ছিলেন তাহার উদ্ভাবনকর্ত্তা।

চারণীদেবীর পরিচারিকার মুখে—তাঁহার ভাগ্যে চিতোর-লাভ ঘটিবার সম্ভাবনা আছে—এই কথা শুনিবার পর হইতেই সূর্য্যমল্লের হৃদয়ে এক নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছিল। সেই দিন হইতে মুহূর্ত্তের জন্যও সেই আশাটা তিনি হৃদয় হইতে দূর করিতে পারেন নাই। তিনি যেখানে যাইতেন এবং যে অবস্থায়ই থাকিতেন না কেন, সর্ব্বদাই মনে হইত, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে 'সূর্য্যমল্ল! তোমার চিতোর লাভ হইবে।' আশার এই বাণী তাঁহার কানে এমনই মধু ঢালিয়া দিতেছিল যে, তাঁহার হৃদয়ে কেবলই জাগিত 'চিতোর আমার! চিতোর আমার!'

আশার এই মোহ-মন্ত্রে প্রণোদিত সূর্য্যমল্ল স্বীয় অভীষ্ট-লাভের জন্য শত সহস্র বিপদকেও অম্লান বদনে আলিঙ্গন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। কিন্তু পৃথ্বীরাজ যখন তারাবাইকে বিবাহ করিয়া দেশে প্রত্যাগত হইলেন, তখন তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইবার এক প্রধান অন্তরায় উপস্থিত হইল। কেমন করিয়া এই অন্তরায় দূর হইতে পারে সেজন্য তিনি যে রীতি অবলম্বন করিলেন, তাহা বস্তুতঃই লজ্জাজনক। মানুষ দম্ভ ও স্বার্থের বশে এমনভাবে কত অন্যায় কার্য্যই না করিয়া থাকে!

সূর্য্যমল্ল সারঙ্গদেব নামক একজন রাজপুতের সহিত মিলিত হইয়া মালবদেশের মুসলমান নরপতি মজফরের নিকট গমন করিলেন। মজফর সূর্য্যমল্লকে সাহায্য করিতে স্বীকৃত হইয়া তাঁহার সাহায্যের জন্য একদল সেনা প্রেরণ করিলেন। এই সেনাদলের সাহায্যে সূর্য্যমল্ল মিবারের দক্ষিণপ্রান্তস্থিত প্রদেশ আক্রমণ করিলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সদ্রি, বটুরো এবং নায়ী ও নিমচের মধ্যবর্ত্তী একটি বিশাল প্রদেশ অধিকার করিয়া ফেলিলেন, —এমন কি চিতোর পর্য্যন্ত অধিকার করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

রাণা রায়মল্ল সূর্য্যমল্লের এই ব্যবহার ক্ষমার চক্ষে দেখিলেন না। তিনি সূর্য্যমল্লের আক্রমণ-গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। তাঁহার নিকট সৈন্য-সংখ্যা তেমন বেশী ছিল না, তথাপি সেই অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াই তিনি রাজদ্রোহীদিগের যথোচিত দণ্ড-বিধানের জন্য চিতোর হইতে সূর্য্যমল্লের দিকে অগ্রসর হইলেন।

চিতোরের নিকট দিয়া গাম্ভিরী নামে যে নদীটি প্রবাহিতা তাহার তীরে দুই পক্ষে যুদ্ধ বাধিয়া গেল। রাণা রায়মল্ল নিজে সামান্য সৈনিকের ন্যায় অসি ধারণ করিয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অনবরত যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার শরীর ক্ষতবিক্ষত হইল, তাঁহার দেহে অসির বাইশটি আঘাত লাগিয়াছিল। তথাপি তিনি প্রাণপণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই—মৃত্যুর ভয় নাই, এমনিভাবে যুদ্ধ করিতে করিতে তাঁহার দেহ অবশ হইল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িতে লাগিল—তাঁহার মূর্চ্ছার উপক্রম হইল।

সেই সময়ে হঠাৎ পৃথ্বীরাজ এক সহস্র সাহসী, বীর ও পরাক্রান্ত অশ্বারোহী সৈনিক লইয়া রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ

হইলেন এবং রাণাকে নিরাপদ স্থানে প্রেরণ করিয়া, নিজে যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

পৃথীরাজ প্রথমেই সূর্য্যমল্লকে তাঁহার পক্ষীয় সৈন্যদল-মধ্য হইতে বাহির করিয়া লইবার জন্য প্রাণপণে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন এবং অবশেষে সূর্য্যমল্লকে সম্মুখে পাইলেন। এইবার সূর্য্যমল্ল ও পৃথীরাজ এই দুইজনে দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। সূর্য্যমল্ল পৃথীরাজের ন্যায় ক্ষমতাশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ক্ষতবিক্ষত হইলেন; তথাপি তিনি যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেন না।

অনেকক্ষণ ধরিয়া উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ চলিল। উভয় পক্ষের বহু সৈন্য মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইল, কিন্তু কোন পক্ষেই জয়-পরাজয়ের চিহ্ন দেখা গেল না। শেষে উভয় পক্ষই ক্লান্ত হইয়া সে-দিনের জন্য রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া নিজ নিজ শিবিরে গমন করিল।

অষ্টম অধ্যায়

শিবিরে প্রত্যাগমন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রামের পর বীরবর পৃথ্বীরাজ পিতৃব্য সূর্য্যমল্লের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহার শিবিরে গমন করিলেন। পৃথ্বীরাজ তথায় যাইয়া দেখিলেন, সূর্য্যমল্ল তাঁহার শিবিরে একটি সামান্য শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহার দেহ ক্ষতবিক্ষত ও রক্তাক্ত; একজন ক্ষৌরকার সেই সমস্ত ক্ষতস্থান ধৌত করিয়া সেলাই করিয়া দিতেছে।

পৃথ্বীরাজকে দেখিতে পাইয়া সূর্য্যমল্ল শত ক্লেশ অগ্রাহ্য করিয়াও শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিলেন এবং যথাসম্ভব সম্ভ্রম ও সম্মানের সহিত তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সূর্য্যমল্ল ভুলিয়া গেলেন যে, এই সেই পৃথ্বীরাজ—এই তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁহার প্রতিযোগী, যাহার শৌর্য্য-বলে তাঁহার আজ এইরূপ শোচনীয় দুর্দ্দশা! যাহাকে বধ করিবার জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং যে তাঁহাকে বধ করিবার জন্যও চেষ্টার কোনরূপ ত্রুটি করে নাই! কিন্তু সূর্য্যমল্ল ও পৃথ্বীরাজ উভয়ের আলাপে

এইরূপ বোধ হইল যে, তাঁহাদের মধ্যে কোনরূপ দ্বেষ, দ্বন্দ্ব বা বিবাদ নাই। বাস্তবিক রাজপুত জাতির চরিত্রেই এমন অদ্ভুত চিত্র দেখা যায়—যাহা অন্য কোন জাতির চরিত্রে খুব কমই পরিলক্ষিত হয়।

শয্যা হইতে উঠিবার সময় সূর্য্যমল্লের দেহের ক্ষতমুখ হইতে পুনরায় প্রবলবেগে রক্ত নির্গত হইতে লাগিল, কিন্তু তাঁহার মুখে কোনরূপ বিষণ্ণ ভাব ফুটিয়া উঠিল না। তিনি সহাস্যমুখে সর্ব্বপ্রকার বেদনার ক্লেশ বিস্মৃত হইয়া পৃথ্বীরাজকে আসনে বসাইয়া তবে শান্তি বোধ করিলেন।

প্রথমে পৃথ্বীরাজ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাকা! আপনার ক্ষতগুলি কেমন আছে?"

সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"বৎস! তোমাকে দেখিয়া আমি এতদূর আনন্দিত হইয়াছি যে, আমার যে কোনরূপ আঘাত ও বেদনা আছে, তাহাই মনে হইতেছে না।"

পৃথ্বীরাজ বলিলেন,—"কাকা! আমি এখনও পিতার সহিত সাক্ষাৎ করি নাই, আপনাকে দেখিবার জন্যই তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়াছি। আমার অত্যন্ত ক্ষুধা পাইয়াছে, আপনার শিবিরে কি কিছু খাদ্যদ্রব্য আছে?"

সূর্য্যমল্ল ভ্রাতুষ্পুত্রের এই কথায় অত্যন্ত আনন্দিত

হইলেন। তৎক্ষণাৎ খাদ্যদ্রব্য সজ্জিত হইল, উভয়ে একসঙ্গে ভোজন করিলেন। বিদায়কালে পৃথ্বীরাজ তাম্বূল চর্ব্বণ-করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন!

প্রতিদ্বন্দ্বী বা শত্রুর প্রতি এইরূপ আতিথেয়তা ও সৌজন্য-প্রদর্শন রাজপুত জাতির একটা বৈশিষ্ট্য। এইরূপ অপূর্ব্ব কাহিনী কেবলমাত্র রাজপুতদিগের ইতিহাসেই দৃষ্ট হয়।

বিদায় লইবার সময় পৃথ্বীরাজ বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাকা! তাহা হইলে কাল প্রাতেই কি আমাদের উভয়ের যুদ্ধ শেষ করিব?"

সূর্য্যমল্ল উত্তর করিলেন,—"বেশ, ভাল কথা; তাহা হইলে খুব প্রত্যূষে আসিও।"

ভোজনান্তে এইরূপ সাদর-সম্ভাষণের পর পৃথ্বীরাজ সূর্য্যমল্লের শিবির হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

নবম অধ্যায়

রাত্রি প্রভাত হইল। আবার সূর্য্যমল্ল ও পৃথ্বীরাজ দুইজনের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল।

সে-দিন সারঙ্গদেব অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিলেন। সারঙ্গদেবের অসি-সঞ্চালনে পৃথ্বীরাজের সৈন্যগণ পর্য্যুদস্ত হইয়া পড়িয়াছিল। সারঙ্গদেবের দেহেও পঁয়ত্রিশটি অস্ত্রের আঘাত লাগিয়াছিল।

সে-দিনের যুদ্ধে দুই দলেরই বহুসংখ্যক সৈন্য নিহত হইল। বিদ্রোহীরা অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াও পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করিতে পারিল না। অবশেষে তাহারা যুদ্ধস্থল পরিত্যাগ করিয়া সদ্রিনগরের দিকে পলায়ন করিল। পৃথ্বীরাজই জয়লাভ করিলেন।

পৃথ্বীরাজ জয়লাভ করিয়া চিতোরনগরে গমন করিলেন। এই যুদ্ধে তাঁহার দেহও যথেষ্ট ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিল।

যুদ্ধে পরাজিত হইয়াও সূর্য্যমল্ল সিংহাসনলাভের আশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না। বার বার পরাজিত হইয়া—অপমানিত হইয়াও তাঁহার প্রাণ হইতে চিতোর-লাভের দুরাশা দূর হইল না!

এইভাবে অনেক দিন চলিয়া গেল। সূর্য্যমল্ল ও পৃথ্বীরাজ তারপরও বহুবার যুদ্ধক্ষেত্রে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু কোন ফল হইল না। পৃথ্বীরাজের সহিত যখন সূর্য্যমল্লের সাক্ষাৎ হইত, তখন সূর্য্যমল্লকে বীর পৃথ্বীরাজ দম্ভভরে বলিতেন,—"আমার দেহে যতক্ষণ পর্য্যন্ত একবিন্দু শোণিত প্রবাহিত হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত আপনাকে মিবারের সূচ্যগ্র-পরিমাণ ভূমিও দিব না।"

সূর্য্যমল্লও সেইরূপ কঠোরস্বরেই বলিতেন,—"তোমার শয়ন করিবার উপযোগী ভূমি ব্যতীত, তাহার অধিক পরমাণু-পরিমাণ ভূমিও তোমাকে অধিকার করিতে দিব না, এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিত থাকিও।"

সূর্য্যমল্ল মুখে এইরূপ বীরত্ব প্রদর্শন করিলেও সর্ব্বদা পৃথ্বীরাজের ভয়ে সন্ত্রস্ত থাকিতেন—সর্ব্বদা দূরে অবস্থান করিতেন। সূর্য্যমল্ল যখন যেখানে পলায়ন করিতেন, পৃথ্বীরাজও তখন সেখানে তাঁহার অনুসরণ করিতেন। এখান হইতে সেখানে—এইরূপে নানাস্থানে গমন করিতে করিতে সূর্য্যমল্ল একদা বাটুয়া নামক গভীর অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সেখানেই একটি ক্ষুদ্র কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। সেই

নিবিড় বনের মধ্যে তাঁহার ঘোটক ও সৈনিকগণ লুক্কায়িত অবস্থায় রহিল।

একদিন রাত্রিকালে সূর্য্যমল্ল সারঙ্গদেবের সহিত একত্রে উপবিষ্ট হইয়া, অগ্নি-সেবন করিতে করিতে বিবিধ বিষয়ের আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময় সেই নির্জ্জন বনভূমি অশ্বের পদশব্দে ও হ্রেষারবে প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এইরূপ অপ্রত্যাশিত শব্দে চমকিত হইয়া উভয়েই খানিকক্ষণ নীরব রহিলেন। তারপর সারঙ্গদেবের দিকে চাহিয়া সূর্য্যমল্ল বলিলেন,— "আর কেহই নহে, বোধ হয় পৃথ্বীরাজ আসিতেছে।"

তাঁহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে-সঙ্গেই পৃথ্বীরাজ আপনার প্রচণ্ড বাহিনী লইয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। পৃথ্বীরাজ পিতৃব্যের সম্মুখে আসিয়াই প্রচণ্ড লম্ফের সহিত অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ভূমিতলে নামিলেন এবং ভীষণ বেগে সূর্য্যমল্লকে আক্রমণ করিলেন। পৃথ্বীরাজ এমন অপ্রত্যাশিতভাবে সূর্য্যমল্লকে আক্রমণ করিলেন যে, এক আঘাতেই সূর্য্যমল্ল ভূপতিত হইলেন।

সারঙ্গদেব সূর্য্যমল্লকে রক্ষা করিয়া পৃথ্বীরাজকে ভৎ‌র্সনা করিয়া বলিলেন,—"এখন এই সামান্য একটি

মুষ্ট্যাঘাত পূর্ব্বের বিংশতিসংখ্যক অস্ত্রাঘাত অপেক্ষাও অসহ্য।”

তাহাতে সূর্য্যমল্ল ম্লান হাসিয়া বলিলেন,—“বিশেষতঃ সেই আঘাত যদি ভ্রাতুষ্পুত্রের নিকট হইতে প্রাপ্ত হই।”

সেই রাত্রিতে সূর্য্যমল্ল আর যুদ্ধ করিতে পারিলেন না। তিনি অতি বিনীতভাবে পৃথ্বীরাজকে যুদ্ধ স্থগিত রাখিতে অনুরোধ করিয়া বলিলেন,—“বৎস! যদি আমি মৃত্যুমুখে পতিত হই, তাহা হইলে আমার কোনও ক্ষতি হইবে না। আমার পুত্রগণ রাজপুত, দেশে দেশে লুটপাট করিয়াও তাহারা আপনাদের জীবিকানির্ব্বাহ করিতে পারিবে; কিন্তু যদি যুদ্ধে তোমার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে চিতোরের কি দশা হইবে? তাহা হইলে লোকে আমার মুখে কালি দিবে, আমি আর কাহারও নিকট মুখ দেখাইতে পারিব না। চিরকালের জন্য আমার নামে অপযশ ঘোষিত হইবে।”

পৃথ্বীরাজ সূর্য্যমল্লের অনুরোধ রক্ষা করিলেন। কাজেই যুদ্ধ স্থগিত রহিল। পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্র পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া কিছুক্ষণের জন্য কঠোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ভুলিয়া গেলেন। তৎপরে পৃথ্বীরাজ সূর্য্যমল্লকে

জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কাকা ! আমার আগমন-সময়ে আপনি কি করিতেছিলেন ?"

সূর্য্যমল্ল স্নেহমাখা স্বরে বলিলেন,—"বৎস ! আহারাদি সমাপনের পর তখন আমি সারঙ্গদেবের সহিত নিশ্চিন্ত মনে গল্প করিতেছিলাম।"

পৃথ্বীরাজ বিস্ময়ের সহিত বলিলেন,—"কাকা ! আমার ন্যায় শত্রু প্রতিনিয়ত আপনার পশ্চাতে থাকিতে আপনি কিরূপে নিশ্চিন্ত ছিলেন ?"

সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"বৎস ! আর কি করিব ? তুমি যে আমাকে একেবারে নিঃসম্বল ও কাতর করিয়া রাখিয়াছ। অতএব তোমার ভয় করিয়া কি করিব ? যে প্রকারে হউক, আমাকে বাঁচিতে হইবে ত ?"

এইরূপ কথোপকথনের পর উভয়েই কিয়ৎকাল নীরব রহিলেন। পৃথ্বীরাজের সৈন্যসামন্ত এবং সঙ্গীয় লোকজন বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকাল পরে পৃথ্বীরাজ সূর্য্যমল্লকে বলিলেন,—"কাকা, এ স্থানের খুব কাছেই যে কালিকাদেবী আছেন, শুনিয়াছি তিনি বড় জাগ্রতা। অতএব স্থির করিয়াছি, কাল তাঁহাকে পূজা দিব। আপনি যদি সঙ্গে যান তাহা হইলে বড়ই সুখী হইব। আর যদি

আপনি শারীরিক দুর্ব্বলতার জন্য অশক্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে সারঙ্গদেবকেও পাঠাইতে পারেন।"

সূর্য্যমল্ল বলিলেন,—"বৎস! আমার শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল। অতএব আমি যে যাইতে পারি, সে সম্ভাবনা অতি অল্প। যদি তুমি দুঃখিত না হও, তাহা হইলে আমার প্রতিনিধি-স্বরূপ সারঙ্গদেবকে পাঠাইতে পারি।"

পৃথ্বীরাজ তাহাতেই সম্মত হইলেন। পরদিন প্রভাত-কালে কালীপূজার আয়োজন হইল। যথারীতি পূজা সুসম্পন্ন হইবার পর বলিদানের সময় আসিল। প্রথমে দেবীর সম্মুখে একটি মহিষ উৎসর্গীকৃত হইল, পরে ছাগবলির উদ্যোগ চলিতে লাগিল। এইরূপ সময়ে সহসা পৃথ্বীরাজ আপন অসি উদ্যত করিয়া সারঙ্গদেবকে আক্রমণ করিলেন। সারঙ্গদেবের সহিতও অস্ত্র ছিল। কাজেই দুইজনের মধ্যে ঘোরতর দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল।

সারঙ্গদেব প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াও পৃথ্বীরাজকে হটাইতে পারিলেন না; পৃথ্বীরাজের হস্তে তিনি নিহত হইলেন। পৃথ্বীরাজ তাঁহার মস্তকচ্ছেদন করিয়া সেই ছিন্ন মুণ্ড কালিকার ভীষণ খর্পরোপরি স্থাপন করিলেন।

অতঃপর তিনি পিতৃব্য সূর্য্যমল্লের কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহ

ভগ্ন করিয়া তন্মধ্যস্থ সমুদয় দ্রব্যজাত লুণ্ঠন করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই পিতৃব্যের বাসভূমি বাটুয়া নামক স্থান আপনার করতলগত করিলেন।

হতভাগ্য সূর্য্যমল্লের বেদনার সীমা রহিল না। তাঁহার সমুদয় আশা নির্ম্মূল হইল। পদে পদে কত বিপদ, কত যন্ত্রণা, কত বন্ধু-বান্ধবের বিচ্ছেদ-যাতনাই তাঁহাকে সহিতে হইয়াছিল! তিনি এই পরাজয়ের পর বুঝিলেন, তাঁহার নিতান্তই দুরদৃষ্ট। অবশেষে নিরুপায় হইয়া জীবনরক্ষার্থ তিনি সদ্রি-অভিমুখে গমন করিলেন।

সূর্য্যমল্ল পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদি তিনি নিজে সদ্রির ভূসম্পত্তি ভোগ করিতে না পারেন, তাহা হইলে এইরূপ লোকের নিকট দান করিয়া যাইবেন, যাহার নিকট হইতে ইচ্ছা করিলে রাজাও কাড়িয়া লইতে পারিবেন না। এই সঙ্কল্পানুযায়ী তিনি নিজ ভূসম্পত্তি ব্রাহ্মণ ও ভট্টদিগকে দান করিয়া চিরতরে মিবারভূমি ত্যাগ করিলেন।

সূর্য্যমল্ল এইভাবে মিবারভূমি পরিত্যাগ করিয়া যখন কনখল-নামক এক মহারণ্যের ভিতর দিয়া যাইতেছেন সে সময়ে হঠাৎ দেখিতে পাইলেন যে, একটি ব্যাঘ্র

একটি ছাগ-শিশুকে হরণ করিবার জন্য বারংবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু সেই শাবকটিকে তাহার জননী ব্যাঘ্রের আক্রমণ হইতে এমন সুকৌশলে রক্ষা করিতেছে যে, ব্যাঘ্র শত চেষ্টা করিয়াও ছাগ-শিশুটিকে লইয়া যাইতে পারিতেছে না !

এই ব্যাপার দেখিয়া সূর্য্যমল্লের মনে চারণীদেবীর পরিচারিকা যোগিনীর কথা স্মরণ হইল। যোগিনীর ভবিষ্যদ্বাণী স্মরণপথে উদিত হইলে তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, এ স্থানে বাস করিলে তাঁহাকে আর বিপদাপন্ন হইতে হইবে না—এ স্থান হইতে কেহই তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিতে পারিবে না।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সূর্য্যমল্ল সেখানেই বাস করিতে প্রস্তুত হইলেন এবং সেখানকার আদিম অধিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া সেই স্থানে দেবগড় নামে একটি দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। দেখিতে দেখিতে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দুর্গ ও তাহার চারিদিকের সহস্র সহস্র পল্লী তাঁহার অধিকৃত হইল।

দশম অধ্যায়

পৃথ্বীরাজ মহা গৌরবের সহিত স্বরাজ্যে ফিরিয়া আসিলেন। রাণা রায়মল্ল পুত্রকে সমাদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। একদিন পৃথ্বীরাজ পিতার নিকট অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইয়াছিলেন, আজ কিন্তু রাণা বীরপুত্রকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে অতুল আনন্দ লাভ করিলেন। পুত্রের গৌরবে তিনি আপনাকেও গৌরবান্বিত মনে করিলেন।

পৃথ্বীরাজ কিছুদিন চিতোরে বাস করিয়া আবার কমলমীর দুর্গে গমন করিলেন। সেখানে তিনি আপনার জ্যেষ্ঠভ্রাতা সঙ্গের অনুসন্ধান করিয়া প্রিয়তমা পত্নী তারার সহিত আনন্দে দিন কাটাইতে লাগিলেন।

কিছুদিন বেশ আনন্দেই কাটিল। এরূপ সময়ে একদা পৃথ্বীরাজ তাঁহার ভগিনীর নিকট হইতে এমন একখানা পত্র পাইলেন, যাহার ফলে তাঁহাদের সুখ ও আনন্দ চিরতরে বিলীন হইয়া গেল।

তাঁহার ভগিনীর স্বামী পাভুরায় ছিলেন শিরোহির রাজা। পাভুরায় ছিলেন মাতাল এবং অহিফেন-সেবী।

তিনি অহিফেন সেবন করিয়া মত্ত অবস্থায় রাত্রিযাপন করিতেন। যখন মত্ততা বৃদ্ধি পাইত, তখন তাঁহার হিতাহিত-জ্ঞান থাকিত না। তিনি সে-সময়ে পশুর ন্যায় জঘন্য ব্যবহার করিতেন; বিশেষতঃ তাঁহার স্ত্রীর প্রতি অতি অমানুষিক অত্যাচার করিতেন। কখনও কুৎসিত গালাগালি করিতেন, কখনও তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইতেন, কখনও বা তাঁহাকে পীড়ন করিয়া ভূমিশয্যায় শোয়াইয়া রাখিতেন। রাজনন্দিনীকে সমস্ত রাত্রি ধূলিশয্যায় অবলুণ্ঠিত দেখিয়াও নিষ্ঠুর পাভুরায়ের প্রাণে করুণার উদ্রেক হইত না!

রাজকুমারী প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও স্বামীকে এইরূপ কুৎসিত ব্যবহার ও কুসংসর্গ হইতে মুক্ত করিতে কৃতকার্য্য হইলেন না; কিছুতেই উদ্ধত স্বামীকে তাঁহার নৃশংস ব্যবহার ও অত্যাচার হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। অবশেষে যখন যন্ত্রণা ও অত্যাচার একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল, তখন সমুদয় বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিয়া, তিনি সহোদর পৃথ্বীরাজকে পূর্ব্বোক্ত পত্রখানা লিখিয়াছিলেন।

একাদশ অধ্যায়

ভগিনীর লিখিত পত্র পাঠ করিয়া পৃথ্বীরাজ দুঃখে ও ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিলেন। পাভুরায়ের এইরূপ অত্যাচারের প্রতিবিধানের নিমিত্ত তিনি অবিলম্বে শিরোহির দিকে যাত্রা করিলেন।

সারাদিন অবিশ্রাম-গতিতে চলিয়া, গলদ্‌ঘর্ম্ম-কলেবরে তিনি গভীর রাত্রিতে পাভুরায়ের প্রাসাদে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। সেই সময়ে তোরণদ্বার রুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল, এই জন্য প্রাসাদের প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াই তিনি ভিতরে প্রবেশ করিলেন এবং একেবারে পাভুরায়ের শয়ন-কক্ষের দিকে চলিলেন। পাভুরায়ের শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি স্বচক্ষে ভগিনীর শোচনীয় অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজ দেখিলেন—ভগিনী ধূলিশয্যায় শায়িতা, নয়নে নিদ্রা নাই, মুখে লাবণ্য নাই; সেই ধূলিশয্যায় শয়ন করিয়াই রাজকুমারী ক্রন্দন করিতেছেন! সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে ভ্রাতাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার শোক-

সাগর উথলিয়া উঠিল, তিনি রুদ্ধকণ্ঠে রোদন করিয়া উঠিলেন। পৃথ্বীরাজ মিষ্টবাক্যে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলেন।

ভগিনীকে সান্ত্বনা দিয়া পৃথ্বীরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে আপনার তরবারি পাভুরায়ের গলদেশে স্থাপনপূর্ব্বক তর্জ্জন গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ভ্রাতার ক্রুদ্ধভাব লক্ষ্য করিয়া পতিপরায়ণা সাধ্বী রাজকুমারী আর স্থির থাকিতে পারিলেন না—ভ্রাতার চরণতলে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন,—"দাদা, আমার স্বামীর প্রাণভিক্ষা দিন, আমাকে বিধবা করিবেন না। বিধবা করিবার জন্য আমি আপনাকে আহ্বান করি নাই।"

সেই দৃশ্য দেখিয়া মাতাল পাভুরায়ের মত্ততাও কোথায় ছুটিয়া গেল। তিনিও অতি করুণকণ্ঠে পৃথ্বীরাজের নিকট আপনার জীবনভিক্ষা করিতে লাগিলেন।

পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে বলিলেন,—"যদি তুমি আমার ভগিনীর পাদুকা মস্তকে ধারণ কর—যদি উহার চরণ স্পর্শ করিতে পার এবং আর কখনও উহার প্রতি কোন রকম অত্যাচার করিবে না বলিয়া প্রতিজ্ঞা কর, কেবল তাহা হইলেই আমি তোমাকে ক্ষমা করিতে পারি—তোমার জীবনদান করিতে পারি।"

পাভুরায় তাহাতেই সম্মত হইলেন। পৃথ্বীরাজ তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন ও বন্ধুভাবে আলিঙ্গন করিলেন।

পাভুরায়ের ব্যবহারে পৃথ্বীরাজ আনন্দিত হইলেন। পাভুরায়ের মৌখিক আদর ও সমাদরে ভুলিয়া তিনি তাঁহাকে অতি সরল-প্রকৃতির লোক মনে করিলেন এবং পাঁচদিন নিশ্চিন্তমনে শিরোহির প্রাসাদে অতিথিরূপে অবস্থান করিলেন।

পাভুরায় কি পৃথ্বীরাজকৃত অপমান বিস্মৃত হইয়াছিলেন? মোটেই নয়।

পৃথ্বীরাজ ভাবিয়াছিলেন, পাভুরায় সমুদয় অপমান ভুলিয়া গিয়াছেন। এই ভ্রমেই শেষে সর্ব্বনাশ ঘটিল—তাঁহার অমূল্য জীবন অকালে ঝরিয়া পড়িল। পাভুরায় এক দিকে যেমন মদ্যপ ও অহিফেন-সেবী ছিলেন, তেমনি দুরাচার, কুটিল, কপট ও বিশ্বাসঘাতকও ছিলেন।

আতিথ্যের প্রথম পাঁচদিন বেশ আনন্দে ও আমোদ-আহ্লাদে অতিবাহিত হইল। ষষ্ঠ দিবস পৃথ্বীরাজ ভগিনী ও ভগিনীপতির নিকট বিদায়-গ্রহণ করিয়া কমলমীর-অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পাভুরায় এক প্রকার মোদক প্রস্তুত করিতে পারিতেন।

পৃথ্বীরাজকে বিদায় দিবার সময় তিনি বেশ সৌজন্যের সহিত কয়েকটি মোদক তাঁহাকে উপহার দিলেন। দুরন্ত পাভুরায় কিন্তু ঐ মোদক কয়টির মধ্যে বিষ মিশ্রিত করিয়া দিয়াছিলেন। সরলপ্রাণ পৃথ্বীরাজ তাহার বিন্দু-বিসর্গও টের পান নাই। তিনি সাদরে ঐ মোদক কয়টি গ্রহণ কয়িয়া শিরোহি পরিত্যাগপূর্ব্বক কমলমীর অভিমুখে চলিলেন।

যাত্রাপথে কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া এক স্থানে বিশ্রাম করিবার সময়, পৃথ্বীরাজ সোল্লাসে ভগিনীপতি-প্রদত্ত মোদকের কিয়দংশ ভক্ষণ করিলেন। মোদক মুখে দেওয়ামাত্রই তাঁহার মস্তক ঘূর্ণিত হইল, হৃদয়মধ্যে অসাধারণ যন্ত্রণা অনুভব করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার সমুদয় দেহ শিথিল ও অবশ হইয়া পড়িতে লাগিল। তিনি অতি কষ্টে কমলমীরের দেবীমাতার মন্দির-প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত গমন করিয়া মন্দিরের সম্মুখেই শুইয়া পড়িলেন, আর এক পা অগ্রসর হইবারও তাঁহার শক্তি রহিল না।

মন্দির-প্রাঙ্গণে শুইয়া পড়িয়াই পৃথ্বীরাজ বুঝিতে পারিলেন, তাঁহার জীবনশেষ হইবার বড় বেশী দেরী নাই।

অমনি প্রিয়তমা তারাকে সংবাদ দিবার জন্য তিনি লোক প্রেরণ করিলেন ; কিন্তু দেহে প্রাণ থাকিতে আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন না।

তারাদেবী নগর হইতে বাহির হইয়া আসিতে না আসিতেই পৃথ্বীরাজের প্রাণপাখী অমরলোকে প্রয়াণ করিল। ভারত-ভাগ্যাকাশের একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইয়া অতল কালসাগরে নিমগ্ন হইল! সমস্ত প্রকৃতি যেন করুণরোলে রোদন করিয়া উঠিল! সমগ্র জগৎ যেন এক প্রবল ভূকম্পনে কম্পিত হইয়া উঠিল!

পতিপ্রাণা তারা প্রাণপতিকে জীবন্ত দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার সেই নির্জীব দেহ ধারণ করিয়া তিনি শোকে দুঃখে মুহ্যমান হইয়া পড়িলেন এবং অবিরল-ধারায় অশ্রুমোচন করিতে করিতে জ্বলন্ত চিতানলে জীবন-বিসর্জ্জন করিলেন।

সম্পূর্ণ